একক ৩ ❑ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির রূপান্তর

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির পূর্বকাল

৩.৩ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

৩.৩.১ ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিপর্যয়

৩.৪ বাণিজ্যিক পর্বকাল

৩.৪.১ পলাশী লুণ্ঠন

৩.৪.২ ব্যক্তিগত বাণিজ্য

৩.৪.৩ বিনিয়োগ ব্যবস্থা

৩.৪.৪ অপহার

৩.৫ ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসসাধন

৩.৫.১ ভারতীয় পণ্য রপ্তানীর উপর আইনগত নিষেধাজ্ঞা

৩.৫.২ কুটীর শিল্পের বিনাশ ও ভূমিহীন কৃষকের উত্থান

৩.৫.৩ কৃষির উপর শিল্পের বিনাশকারী প্রভাব

৩.৫.৪ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল

৩.৬ কোম্পানীর আয়ের অন্যান্য ক্ষেত্র

৩.৬.১ ভারতীয় সম্পদের নিগর্মণ

৩.৭ শিল্প পুঁজির সময়কাল

৩.৭.১ ভারতীয় সম্পদ ও ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব

৩.৭.২ বাণিজ্য পুঁজি ও শিল্প পুঁজির উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য

৩.৭.৩ কৃষির বাণিজ্যকরণ

৩.৭.৪ অসম শুল্ক ব্যবস্থা ও অর্থকরী ফসল উৎপাদনে উৎসাহ

৩.৮ ফিনান্স পুঁজি পর্বকাল
৩.৮.১ ফিনান্স পুঁজির প্রয়োগ ও রেলপথ স্তাপন
৩.৮.২ শোষণের নতুন ক্ষেত্র ঃ রেলপথ
৩.৮.৩ ভারতবর্ষ ঃ শোষনের মুক্ত বাজার
৩.৮.৪ রেলপথ স্থাপনের ফলাফল
৩.৮.৫ ভারতে শিল্পোদ্যোগের অভাব
৩.৮.৬ শিল্পায়নের সূচনা
৩.৮.৭ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি
৩.৮.৮ বিশ্বব্যাপী মন্দা ও ভারতীয় শিল্প
৩.৯ স্বাধীন ভারতের শিল্পোদ্যোগ
৩.১০ সারাংশ
৩.১১ প্রশ্নাবলী
৩.১২ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

আলোচ্য এককটিতে ভারতীয় অর্থনীতির রূপান্তরের কারণগুলি বিশ্লেষিত হয়েছে। এই এককটি পাঠ করে নিম্নলিখিত কারণগুলি আপনারা চিহ্নিত করতে পারবেন।

- প্রাক ঔপনিবেশিক স্বয়ংসম্পূর্ণ ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর বিনাশ;
- ভারতীয় অর্থনীতির ঔপনিবেশিক চরিত্র গ্রহণ ;
- বাণিজ্যপুঁজি, শিল্প পুঁজি ও ফিনান্স পুঁজির নিয়ন্ত্রণে ভারতের ঔপনিবেশিক অর্থনীতি;
- ভারতীয় সম্পদের নির্গমণ, শিল্প বাণিজ্যে বিপর্যয় ও কৃষিক্ষেত্রে সঙ্কট;
- ভারতে রেলপথের স্থাপন এবং শোষণের নতুন উপায় গ্রহণ।

৩.১ প্রস্তাবনা

ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতবর্ষে আগমনের পর কালক্রমে এই দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। এই পরিবর্তন হয়েছিল সামগ্রিক, ফলে পুরাতন ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন সম্ভব হয়নি। জাতীয় জীবনের সর্বত্র এই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল অথচ তা ভারতবাসীর উপকারে লাগেনি।

ভারতবর্ষ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র থেকে কাঁচামাল যোগানদারী উপনিবেশে রূপান্তরিত হয়েছিল। ব্রিটিশ জনতার হিতসাধনে ব্যবহৃত হল ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্র, অর্থনীতি এবং এর পিছনে ব্রিটিশ প্রশাসনের সম্পূর্ণ সহযোগিতা ছিল। ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকে বার বার বিদেশী আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে কিন্তু ভারতীয় শিল্প, বাণিজ্য, কৃষির বিনাশ হতে দেখা যায়নি। ব্রিটিশ বাণিজ্য কোম্পানির কার্যকলাপ ছিল উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কারণ ভারতকে যথেচ্ছভাবে শোষণ করে মাতৃভূমি ইংল্যান্ডকে সমৃদ্ধ করে তোলাই ছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই বাণিজ্য কোম্পানির পরিচালনায় ভারতে ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। পলাশীর যুদ্ধের পর ব্রিটিশ শক্তি ভারতে এক ব্যাপক ও সর্বাত্মক পরিবর্তন সূচিত করে। এই সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনে ভারত রূপান্তরিত হয় ব্রিটেনের উপনিবেশে এবং ভারতের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য তথা ভারতের অর্থনীতি উপনিবেশিক অর্থনীতিতে পরিবর্তিত হয়।

৩.২ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির পর্বকাল

ব্রিটিশ বাণিজ্য কোম্পানি ভারতের ঐতিহ্যবাহী শিল্প-বাণিজ্য এবং চিরাচরিত কৃষি প্রথার ধ্বংসসাধন করে। তবে ধ্বংস সাধনের এই প্রক্রিয়াটি ছিল দীর্ঘ এবং ধারাবাহিক। এই ধ্বংস সাধনের সময় কালকে তিনটি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম পর্বের সময়াকালে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অপ্রতিহত গতিতে চলতে থাকে। এই পর্বকে পুরোনো ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা পরিচালিত একচেটিয়া বাণিজ্যের (Monopoly Trade) যুগ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এই সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ভারতে বাণিজ্য পুঁজির (Marchant Capital) উদ্ভব হয়।

দ্বিতীয় পর্বের সময়ে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে সূচিত হলো শিল্প-পুঁজি (Industrial Capital) পরিচালিত অবাধ বাণিজ্য (Free Trade) ব্যবস্থা। তৃতীয় পর্ব কালটি ব্যাপ্ত ছিল পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্বকাল পর্যন্ত। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে ফিনান্স পুঁজি (Finance Capital) পরিচালিত করেছিল ভারতের ঊপনিবেশিক অর্থনীতি।

৩.৩ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

উপরিউক্ত ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সময়কালের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রথম পর্বে ভারতে ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য ছিল ঃ

১। ভারতীয় সম্পদের যথেচ্ছ লুণ্ঠন;

২। অর্থনৈতিক শোষণ;

৩। ইচ্ছাকৃতভাবে ভারতের কৃষি, শিল্পের বিনাশ সাধন;

৪। ইংল্যান্ডে রপ্তানীযোগ্য ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক আরোপ।

দ্বিতীয়পর্বে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

১। কৃষির উপর অত্যাধিক চাপ সৃষ্টি করা;

২। নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে কৃষকদের কাছ থেকে কর আদায় করা;

৩। ভারতের শিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিকে বিনষ্ট করে দেওয়া;

৪। শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কৃষিক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করা।

তৃতীয় পর্বের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হলো ঃ

১। ভারতের শিল্প ব্যবস্থাকে অনুন্নত করে রাখা;

২। ভারতের অর্থনীতির ঔপনিবেশিক চরিত্র বজায় রাখা;

৩। কৃষিক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র টিকিয়ে রাখা;

৪। ব্রিটিশ পুঁজির রপ্তানী ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা।

৩.৩.১ ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিপর্যয়

এইভাবে বাণিজ্যপুঁজি, শিল্পপুঁজি ও ফিনান্স পুঁজির সময়কালে ভারতের ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ভিত্তিটি গড়ে উঠেছিল। ভারতের ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বনিয়াদ গড়ে উঠল ইংল্যান্ডের স্বার্থে এবং তা ব্রিটিশ সমাজ ও অর্থনীতির পুষ্টি সাধন করেছিল। পক্ষান্তরে ভারতীয় কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য ক্রমশ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হতে এক সময়ে বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে যায়। ভারতীয় অর্থনীতির এই মূল ভিত্তি যথা কৃষি শিল্প বাণিজ্য ধ্বংস হবার ফলে অর্থনৈতিক কাঠামোর বিপর্যয় সূচিত হয়।

৩.৪ বাণিজ্যিক পর্যকাল

ভারতীয় অর্থনীতির ঔপনিবেশিক রূপান্তরকে বা ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের অর্থনৈতিক শোষণের সময়কালকে তিনটি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮১৩ সাল পর্যন্ত সময়কালে ভারতে চলেছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যথেচ্ছ লুণ্ঠন, লুণ্ঠিত হয়েছিল ভারতের সম্পদ। পলাশীর যুদ্ধের পর ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে জয়ী হয়ে কোম্পানি বাংলার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব লাভ করে এবং বাঙলার স্বাধীন নবাবী শাসনের অবসান হয়। ব্রিটিশ বাণিজ্য কোম্পানী এরপর একচেটিয়া বাণিজ্য পরিচালনা করতে থাকে। এই সময়ে যে বাণিজ্য নীতি গৃহীত হলো তখন থেকেই ভারতের অর্থনীতি ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্থ হতে শুরু করে। শিল্প বাণিজ্য লোপ পায় কারণ এই সময় অবারিত ছিল ব্যক্তিগত বাণিজ্য। কোম্পানির কর্মচারীরা নানাভাবে অর্থ উপার্জন করেছিলেন। এই অর্থ এসেছিল পারিতোষিক গ্রহণ ও উপঢৌকণের মাধ্যমে।

৩.৪.১ পলাশী লুণ্ঠন

ইংরাজ বণিকরা এই সময়ে যেন সম্পদ লুণ্ঠনের নেশায় মেতে উঠেছিল। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৭৬৬ সালের মধ্যে বাংলা থেকে ষাট কোটি পাউন্ড অর্থ আদায় করা হয়। এই অর্থ আদায়কে পলাশীর লুণ্ঠন নামে অভিহিত করা হয়েছে। বাংলার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়তে থাকে এবং ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষের অবস্থা বাংলার মতো হয়ে পড়ে।

৩.৪.২ ব্যক্তিগত বাণিজ্য

উপহার, পারিতোষিক আদায় করা ছাড়াও কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে আয়ের পথ প্রস্তুত করে নিয়েছিল। এই সময়ে অবারিত ছিল ব্যক্তিগত বাণিজ্য। ঐতিহাসিক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিনহা তাঁর Economic History Bengal Vol-II,-তে লিখেছিলেন যে কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত বাণিজ্য থেকে যা আয় করতোতা প্রাপ্ত উপঢৌকণের থেকে বেশি ছিল। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে দস্তক ব্যবহার করে বিনা শুল্কের বাণিজ্য ১৭৫৭-১৭৬৮ সালের মধ্যে বিশাল আকার ধারণ করেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত ১৭৭৭ সালে এই ব্যবসার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

৩.৪.৩ বিনিয়োগ ব্যবস্থা

কোম্পানির কর্মচারীরা উদ্বৃত্ত আদায় থেকে বিনিয়োগ করে বাণিজ্য করতো। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় দেশীয় অর্থ দিয়ে অতিরিক্ত কম মূল্যে পণ্য ক্রয় করে ইউরোপের বাজারে চালান দেওয়া। একে বিনিয়োগ বা Investment বলা হতো। প্রকৃতপক্ষে পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানির বাণিজ্যে পরিবর্তন আসে। ইতিপূর্বে কোম্পানীর ভারতীয় পণ্যদ্রব্য যেমন কাঁচা তুলো, রেশম, লবন, পাট, আফিম, সোরা, পান প্রভৃতি অল্প মূল্যে ক্রয় করে ইউরোপের বাজারে চড়া মূল্যে বিক্রী করাতো। কিন্তু রাজনৈতিক প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা করে কোম্পানি বাণিজ্যের উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করেছিল। ইতিমধ্যে লুণ্ঠন ও উপঢৌকণ প্রভৃতির ফলে যে প্রচুর পরিমাণ অর্থ লাভ হয়েছিল তাই থেকেই পণ্য ক্রয় করে ইংল্যান্ডে পাঠান হতে লাগল। বাংলায় সংগৃহীত অর্থের মাধ্যমেই পণ্য ক্রয় করার অর্থ সংগ্রহ করা হলো। এক বিপুল পরিমাণ অর্থ বাংলা থেকে ইংল্যান্ড অভিমুখে অপসারিত হয়ে গেল।

৩.৪.৪ অপহার

বাংলা থেকে ইংল্যান্ড অভিমুখে অপসারিত হয়ে গেল ভারতের প্রভূত পরিমাণ অর্থ। একে ঐতিহাসিকেরা এই প্রতিদানহীন অর্থ চালান বা অপহার বলে অভিহিত করেছেন। ১৭৫৭-১৭৭২ পর্যন্ত সময়কাল ছিল লুণ্ঠনের সময়কাল এবং ১৭৭২-১৮১৩ পর্যন্ত সময়কালে প্রতিদানহীন এই অর্থের চালান অব্যাহত ছিল। ১৭৮০-১৮১৩ সালের মধ্যে অপহারের পরিমাণ ছিল তিন কোটি পাউন্ড (৩০,০০০,০০০) ১৮১৩ সালের চার্টার আইনে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হল কিন্তু ভারতীয় সম্পদের নির্গমণ রোধ করতে পারা যায়নি। বাণিজ্য পুঁজির সময়কালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের বাণিজ্য ও উৎপাদন ব্যবস্থার উপর একচ্ছত্র

আধিপত্য স্থাপন করেচিল এবং সুপরিকল্পিত উপায়ে দেশীয় ব্যবসায়ী ও উৎপাদক গোষ্ঠীকে ধ্বংস করে ফেলেছিল। কারিগর, উৎপাদক এমনকি বণিকগোষ্ঠীর একসময়ে ব্রিটিশ কোম্পানির শ্রমিকে পরিণত হয়েছিল।

৩.৫ ভারতীয় শিল্পের ধ্বংস সাধন

শিল্প বিকাশের দিক থেকে ভারতবর্ষ যথেষ্ট উন্নত ছিল। এখানে সর্বাপেক্ষা উন্নত ছিল বয়ন শিল্প। বয়ন শিল্পকে কেন্দ্র করে নগর অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল যেমন ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, সুরাট, কাশ্মীর, বেনারস প্রভৃতি অঞ্চল মসলিন, সিল্ক, সুতী, পশম বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ, তামা ইত্যাদির ধাতু শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল দিল্লী, মথুরা, পুরী, আগ্রা, গুজরাট, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি শহরগুলি। কোলাপুর, সাতারা, শোলাপুর, আহমদনগর ও গোরখপুর ছিল কাঁচ শিল্প। এছাড়া ভারতবর্ষে চিল জাহাজ নির্মাণশিল্প। গোয়া, কাম্বে প্রভৃতি অঞ্চলে নির্মিত হতো হাজার টন মাল পরিবহন ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজ। ১৭৬১-১৮২১ সালের মধ্যে কলকাতায় ২৩৫টি জাহাজ তৈরি হয়েছিল যা এশিয় বাণিজ্যে নিযুক্ত হয়েছিল। কলাকাতার রামদুলাল দে, পাঁচু দত্ত, রামগোপাল মল্লিক প্রমুখ ছিলেন বাঙ্গালী জাহাজ মালিক। পাটনা, দিল্লী, রাজগীর, শিয়ালকোট শাহজাদপুর ছিল কাগজশিল্পের জন্য বিখ্যাত। ভারতে উৎকৃষ্টমানের মসৃণ কাগজ তৈরি হত যা দিয়ে 'ফরমান' লেখা হত। এছাড়া ছিল চর্ম, চিনি, মৃৎপাত্র, সুগন্ধ, হাতী দাঁত, বাঁশ ও কাঠ প্রভৃতি শিল্প। ব্রিটিশ কোম্পানির সময়কালে লুণ্ঠন, বর্বরতা ও পরিকল্পিত আক্রমণে এইসব শিল্প, শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কারিগর সম্প্রদায় এবং শিল্পের সঙ্গে জড়িত অঞ্চল ও নগরগুলিও ক্রমে ভগ্নপ্রায় হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাই শিল্পসমৃদ্ধ ভারতের চিত্র পরিবর্তিত হয়ে যায়। ভারত যেসব পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করত তা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে ভারতবর্ষ রপ্তানিকারী দেশ থেকে আমদাননিকারী দেশে পরিণত হয়।

৩.৫.১ ভারতীয় পণ্য রপ্তানির উপর আইনগত নিষেধাজ্ঞা

ভারতবর্ষ রপ্তানি করত সুতীবস্ত্র, খাদ্যসশস্য, তৈলবীজ, চিনি, চাল, নীল, কর্পূর, লবঙ্গ, নারকোল, পশুচর্ম আফিম, গোলমরিচ, চন্দনকাঠ, গণ্ডারের শৃঙ্গ প্রভৃতি। ভারতীয়রা যাতে এইসব পণ্য রপ্তানি করতে না পারে সেজন্য আইন বলবৎ করা হয়।

জাভা, সুমাত্রা, শ্যামদেশ, হল্যান্ড, ইংল্যান্ডে চাহিদা ছিল ভারতীয় সূতীবস্ত্রের। এমনকি জার্মানির দামী লিনেনের তুলনায় ভারতের কমমূল্যের সূতী, ক্যালিকোর লংক্লথ, ব্রড ক্লথ প্রভৃতির আমদানি বেশি হত। ভারতীয় সূতীবস্ত্রের উৎকৃষ্টতার কারণে জনপ্রিয়তা খর্ব করতে ইংল্যান্ডের শিল্পপতিরা আগ্রহী হয়ে আইনের দ্বারা ভারতের বয়নশিল্প ধ্বংস করতে মরিয়া হয়ে উঠত। ১৭০০ ও ১৭২০ সালের আইনে ভারতীয় সূতীবস্ত্রের ব্যবহার ও ১৭৮০ সালে ভারত থেকে রঙীন সূতীবস্ত্র রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। ১৮১৪ সালে কোম্পানির স্বার্থে আইন প্রণয়ন করে ভারতীয় জাহাজ শিল্পকে নিষিদ্ধ করা হয়। দেশী কাচ শিল্প বিদেশী কাচ দ্রব্যের সামনে বেশ দিন টিকে থাকতে পারেনি। ভারতের অন্যান্য শিল্পগুলিকে রক্ষা করার কোন

চেষ্টা ইংরাজ সরকার না করা শিল্পগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। একই সঙ্গে একদা সমৃদ্ধ ভারতের শিল্পপ্রদান শহরগুলিও ধ্বংস হয়ে যায়। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল শিল্পায়নের প্রতি অনীহা। আরো বিশদভাবে বলা যায় যে ব্রিটিশ সরকার এখানে অনুন্নত শিল্পব্যবস্থাকেই টিকিয়ে রাখল।

৩.৫.২ কুটিরশিল্পের বিনাশ ও ভূমিহীন কৃষকের উত্থান

সুতরাং বলা যায় ব্রিটিশ বাণিজ্য কোম্পানির পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্য বৃদ্ধি তার অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে যেমন দৃঢ় করেছিল তেমনই উপনিবেশগুলির আর্থিক কাঠামো ধ্বংস হয়ে যাবার ফলে সমৃদ্ধশালী ভারতের চিত্রটি পরিবর্তিত হয়ে যায়। ভারতের সমৃদ্ধ কুটিরশিল্প অবক্ষয়ের মুখে পড়ে। ভারতীয় রাজন্যবর্গ, অভিজাত প্রমুখরা ছিলেন কুটিরশিল্পের পৃষ্ঠপোষক। তাঁদের অবলুপ্তি এই শিল্পের বিনাশ ডেকে আনে। ইতিপূর্বে ভারতীয় রাজা অভিজাতদের সামরিক প্রয়োজনে তৈরি হত অস্ত্রশস্ত্র কিন্তু ব্রিটিশ কোম্পানি ব্রিটেনে প্রস্তুত সমরাস্ত্র ক্রয় করতে মনোযোগী হন। তাই অস্ত্রশিল্প ও শিল্পীরা কর্মচ্যুত হয়ে পড়ে। যারা এখানে পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সমস্ত ভারতীয় শিল্পে বিনাশ সাধন করে ভারতবর্ষকে কাঁচামাল রপ্তানিকারী রাষ্ট্রে পরিণত করলেন। এখানে শিল্প, শিল্পী, কারিগর শ্রেণীর অবলুপ্তি ঘটালেন। এই গোষ্ঠী চাপ সৃষ্টি করল জমির উপর। সমাজে উদ্ভূত হল একশ্রেণীর ভূমিহীন কৃষকের।

৩.৫.৩ কৃষির উপর শিল্পের বিনাশকারী প্রভাব

শিল্পের বিনাশ কৃষির উপর এক ঋণাত্মক প্রভাব ফেলেছিল। ইংরাজ কোম্পানি কৃষির উন্নয়নের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি যাতে জমির উর্বরতা ও ফসলের বৃদ্ধি হয় অথচ বৃদ্ধি পেয়েছিল রাজস্ব। কোম্পানি ১৭৬৯ সালে পরে সমগ্র বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করে। কোম্পানির উদ্দেশ্য ছিল এমন এক নতুন জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি করা যারা প্রজাদের কাছ থেকে যে কোন উপায় অবলম্বন করে প্রভূত পরিমাণ রাজস্ব আদায় করতে পারবে আর এরাই হবে কোম্পানি শাসনের সামাজিক ভিত্তি। ইতিপূর্বে জমিদার শ্রেণী খাজনা আদায়ের অধিকার ভোগ করতেন এবং খাজনার নির্দিষ্ট অংশ নবাবের রাজস্ব দপ্তরে জমা দিতেন। রাজস্ব আদায়ের এই অধিকার জমিদার শ্রেণী উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগ করতেন কিন্তু কোন সময়েই জমিদারী বিলুপ্ত হবার কোন তথ্য পাওয়া যায় না। অথচ কোম্পানি রাজস্বের অধিকার পাবার পরই বার্ষিক জমি বন্দোবস্তের ব্যবস্থা চালু করে। জমি বন্দোবস্ত করার জন্য নীলামের ব্যবস্থা শুরু হয়। যে জমিদার সর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণ রাজস্ব আদায় করে দেবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিতে পারতেন তাকেই কোম্পানির পক্ষ থেকে রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হত। এইভাবে একশ্রেণীর জমিদার কোম্পানির অনুগ্রহভাজন হয়ে অসম্ভব জুলুম পীড়ন করে সর্বাধিক হারে কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে লাগল আর একশ্রেণীর জমিদার অতিরিক্ত প্রজাপীড়নে ব্যর্থ হয়ে জমিদারী হারিয়ে ফেললেন। শেষ পর্যন্ত কোম্পানি ও তার অনুগ্রহভাজন জমিদারদের অমানুষিক অত্যাচারের ফলে বাংলায় দেখা দিল ১৭৭০-৭১ সালের ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১৪৭৬ সন)

নামে পরিচিত। জনসংখ্যার তিনভাগের একভাগ দুর্ভিক্ষে মারা গেল তবুও কোম্পানি কৃষকদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারলেন না, এই বছরই কৃষকদের কাছ থেকে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশ রাজস্ব আদায় হল। এই বেশি আদায়ের অর্থ ছিল ২ লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা। আগের বছরের আদায়ীকৃত অর্থের তুলনায় বেশি। পরবর্তী বছরে তের লক্ষ টাকা বেশি আদায় করা হল। এইরূপ অধিক আদায় করা হত পীড়ন, দৈহিত অত্যাচার প্রভৃতির মাধ্যমে। এমনকি মৃত প্রজার কাছে প্রাপ্য খাজনা তার জীবিত প্রতিবেশির কাছ থেকে আদায় করা হয়েছিল। সরকারি দফতর থেকে এর তথ্য পাওয়া যায়।

৩.৫.৪ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল

রাজস্ব ব্যবস্থাকে আরো বিন্যস্ত ও নিয়মিত করার জন্য বহু আলোচনার পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রণয়ন করা হয়। এই বন্দোবস্তে জমিদারকে প্রকৃত জমির মালিক বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের প্রায় চতুর্থাংশ এবং উত্তরপ্রদেশের কয়েকটি জেলায় এই বন্দোবস্ত প্রয়োগ করা হয়। তবে এই বন্দোবস্তে প্রজার দেয় খাজনার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা ছিল না অথচ জমিদারগণ পেয়েছিলেন জমির বন্দোবস্ত ও খাজনা নির্ধারণের অধিকার তাই জমিদারগণ অনেকক্ষেত্রেই উচ্চহাতে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করতে থাকেন। তাই প্রজাদের দুর্দশা কোনভাবেই হ্রাস পায়নি। পরবর্তীকালে জমিদাররা গ্রাম ছেড়ে শহরে জীবনযাপন করতে তখন জমিদারদের প্রতিনিধিদের (নায়েব, গোমস্তা) হাতে কৃষক ও প্রজাদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। প্রজাদের দুঃখ দূর করার কোন চেষ্টা কোম্পানির ছিল না বরং কোম্পানি চেয়েছিল পছন্দমতো একদল জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি করা; যারা হবেন কোম্পানি শাসনের সমর্থক মিত্রপক্ষ; যারা বৃদ্ধি করবেন কোম্পানির প্রশাসনের সময়কাল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনের কারণে বহু জমিদার উৎখাত হলে জমিদারী হস্তান্তরিত হয়ে যায়। এইসব জমিদারী যারা ক্রয় করতেন তাঁরা ছিলেন বেশিরভাগ ব্যবসায়ী শ্রেণী। জমির সঙ্গে তাদের যোগ ছিল না, যারা কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে অনাগ্রহী ছিলেন। ফলে কৃষি ও কৃষক উভয়ের অবস্থা দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে যায়। কৃষি উৎপাদন কমে যেতে থাকে, কৃষকরা জমি হারিয়ে ফেলতে থাকেন। গ্রামীণ অর্থনীতির এই বিপর্যয়ে কিন্তু কোম্পানির আয়ের উপর কোন প্রভাব পড়েনি। কোম্পানির ১৭৯০-৯১ সালে আদায়ীকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ২৬ লক্ষ ৮০ হাজার পাউন্ড যা ছিল ১৭৬৫-৬৬ সালের আদায়ের দ্বিগুণেরও বেশি। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই আদায়ের পরিমাণ ছিল চারজনের বেশি (হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : ভারতবর্ষের ইতিহাস)।

৩.৬ কোম্পানির আয়ের অন্যান্য ক্ষেত্র

কোম্পানি এই সময়ে ভূমিরাজস্ব ছাড়া, বাণিজ্যশুল্ক লবণ কর, আফিম শুল্ক, তীর্থকর প্রভৃতি থেকে আয়ের পথ প্রস্তুত করে নিয়েছিল। বাণিজ্য পুঁজির সময়কালে ইংরাজ কোম্পানির অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতীয় সম্পদের যথেচ্ছ লুণ্ঠনের মধ্যে। এছাড়া ভারতের রাজস্ব সরাসরি কোম্পানির আয়ত্তে চলে এলে

ব্রিটেনের পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকশিত হতে থাকে। সুতরাং ভারতের অর্থ, রাজস্ব, সম্পদ প্রভৃতির এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক প্রগতির মূলে। ঐতিহাসিক-অর্থনীতিবিদ্‌দের রচনায় দেখা যায় ব্রিটেনের তৎকালীন জাতীয় আয়ের প্রায় দুই শতাংশ ভারতের অর্থ, রাজস্ব থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

৩.৬.১ ভারতীয় সম্পদের নির্গমন

ভারতীয় সম্পদ লুণ্ঠন, উপঢৌকণের রূপে স্বদেশ থেকে নির্গত হয়ে যেতে থাকে। এছাড়া বাণিজ্য ও উৎপাদন ব্যবস্থার উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে। এর ফলে ভারতের উৎপাদক শ্রেণী, বণিকগোষ্ঠীর বিকাশ হয়। ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং আইন পাস হলে কোম্পানির কর্মচারীরা দেশীয় রাজা নবাবদের কাছ থেকে উপহার, পারিতোষিক গ্রহণ নিষিদ্ধ হয়। ১৮১৩ সালের চার্টার আইন পাস করে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার রদ করা হল। শুধুমাত্র চীন রাষ্ট্রের সঙ্গে কোম্পানির একচ্ছত্র বাণিজ্য বহাল রইল। ১৮১৩ সালের সনদ আইনে ভারতবর্ষের বাণিজ্য সকল ইউরোপীয়দের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। ইংরাজ পুঁজিপতিদের ভারতীয় কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে অর্থবিনিয়োগের অধিকার দেওয়া হয়।

৩.৭ শিল্পপুঁজির সময়কাল

১৮১৩ সালের সনদ আইনে অবাধ বাণিজ্যনীতি ভারতে নতুন যুগের সূচনা করে। কারণ এই আইন পাস হয়ে যাবার পর থেকে ভারতে আসতে থাকে প্রচুর পরিমাণে ব্রিটেনের শিল্পজাত পণ্য। এই পণ্য আমদানির উপর ধার্য হয়েছিল নামমাত্র বাণিজ্য শুল্ক। অন্যদিকে ভারতীয় পণ্যের উপর অধিক চড়া হারে রপ্তানি শুল্ক বহাল ছিল তাই যেভাবে ব্রিটিশ পণ্য অবাধে ভারতের সর্বত্র ব্যাপ্ত হতে পারল সেই সুযোগ থেকে ভারতীয় পণ্য বঞ্চিত হ'ল। ভারতের শিল্প অর্থনীতি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায় এবং ভারতবর্ষের অর্থনীতি প্রকৃতপক্ষে ঔপনিবেশিক কৃষি অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়।

৩.৭.১ ভারতীয় সম্পদ ও ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব

ভারতের শিল্প বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে অসংখ্য বণিক, কারিগর, শিল্পীরা বেকার হয়ে যান। অন্যপক্ষে ভারতের অভাবনীয় পরিমাণ সম্পদ ব্যবহার করে ইংল্যান্ডে এলো শিল্প বিপ্লব। ব্রিটেনে গড়ে উঠল বিশাল শিল্প-কারখানা আর ভারতের শিল্প ধ্বংস হয়ে গেল। ভারতে দেখা দিল মূলধনের ব্যাপক ঘাটতি অন্যদিকে ব্রিটেনে পুঁজির ভান্ডারে জোয়ার এল, গড়ে উঠল শিল্পপুঁজি। শিল্পবিপ্লব ব্রিটিশ পণ্য উৎপাদনে গতিবেগ সঞ্চার করে অপরপক্ষে সমৃদ্ধ ভারত দরিদ্রতম দেশে রূপান্তরিত হয়।

৩.৭.২ বাণিজ্য পুঁজি ও শিল্প পুঁজির পার্থক্য

ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লবের ফলে কলকারখানা গড়ে উঠতে থাকে এবং উৎপাদন বিশালাকার ধারণ করে। শিল্পপতিদের হাতে সঞ্চিত হয় শিল্পপুঁজি। বাণিজ্যপুঁজির সময়ে যেমন বাণিজ্য কোম্পানির উদ্দেশ্য ছিল

একচেটিয়া বাণিজ্যকে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তেমনই শিল্পপুঁজির সময়ে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক শোষণের চিত্রটি অন্যরকম হয়ে যায়। বাণিজ্য পুঁজি একচেটিয়া বাণিজ্য সম্পাদন করে ভারতের অর্থনীতিকে শোষণ করে। একইভাবে শিল্পপুঁজি বর্ধিত পরিমাণ শিল্পদ্রব্যের সম্ভার ভারতে ঔপনিবেশিক বাজারে বিক্রিত হবার সম্ভাবনাকে সুনিশ্চিত করতে প্রয়াসী হল। শিল্পপুঁজির উদ্দেশ্য হল ভারতবর্ষকে একটি খোলা বাজারে পরিণত করা অর্থাৎ ব্রিটিশ শিল্পজাত পণ্য বিক্রয়ের উন্মুক্ত অঞ্চল হবে ভারতবর্ষ। পুঁজিপতিদের স্বার্থে ব্যবহৃত হতে থাকল ভারতের ঔপনিবেশিক কৃষি-অর্থনীতি। কারণ শিল্পপুঁজি ব্রিটিশ পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন কাঁচামাল যোগানদারী দেশ হিসাবে ভারতের কৃষি-অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে চাইল। শোষণের এই নতুন ধারাকে অ্যাডাম স্মিথের সংজ্ঞা অনুযায়ী নতুন ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। ভারতবর্ষের অবস্থান বর্ণনা হত ব্রিটেনের উপনিবেশরূপে।

৩.৭.৩ কৃষির বাণিজ্যকরণ

ভারতকে কাঁচামাল যোগানকারী দেশে পরিণত করার জন্য এখান থেকে কৃষিজ পণ্য চালান দেওয়া হতে থাকে। বাণিজ্যিক অর্থকরী ফসল যেমন কাঁচা তুলো, চা, রবার, নীল, কফি, পাট, তিসি প্রভৃতি উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া হয়। এছাড়া ব্রিটেনের শ্রমিকশ্রেণীর ভরণপোষণের জন্য ভারত থেকে খাদ্যশস্য রপ্তানি করা হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে শিল্পের জন্য কাঁচামাল ও শিল্পকারখানার শ্রমিকদের জন্য খাদ্যশস্য রপ্তানিকারী দেশরূপে ভারত তখন নতুন ভূমিকা পালন করতে থাকে। একটি বিষয় এখানে স্পষ্ট যে ব্রিটিশ সরকার যেন এই ধারণা পোষণ করতেন যে ভারতের শিল্পায়নের কোন প্রয়োজন নেই এবং মৃতপ্রায় যে শিল্পগুলি, তখন ভারতে রয়ে গেছে তারও উন্নয়নের প্রয়োজন নেই। বাংলা, বিহার, আসাম প্রভৃতি পূর্বভারতীয় অঞ্চলগুলির অর্থকরী ফসল যেমন আফিম, নীল, পাট, চা ইত্যাদি পণ্য যোগানের মূল অঞ্চল হয়ে ওঠে। এখানে ব্রিটিশ এজেন্সিগুলি রপ্তানি বাণিজ্যে অংশে নেয়। তারা চা-বাগান, নৌ-পরিবহন, ব্যবস্থা, পাট-কারখানা, কয়লাখনি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে বিশ্ব বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। স্বতন্ত্র বাণিজ্যকারী রাষ্ট্র হিসাবে নয় ব্রিটেন উপনিবেশরূপে।

৩.৭.৪ অসম শুল্ক ব্যবস্থা ও অর্থকরী ফসল উৎপাদনে উৎসাহ

রাজধানী কলিকাতাকে নিয়ে পূর্ব ভারতীয় অঞ্চল ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির এক “Clsssic example” অর্থাৎ প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ব্রিটিশ শিল্পপুঁজির প্রয়োজনে ভারতবর্ষে আদর্শ উপনিবেশে পরিণত হয়। ইংল্যান্ডে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যের প্রয়োজনে ভারতীয় শিল্প সমূলে ধ্বংস করা হল। ব্রিটিশ সরকার এই সময়ে ভারতে অসম শুল্ক নীতি প্রবর্তন করেন। এই অসম শুল্ক শতকরা দশ ভাগ থেকে হাজার ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। অস্বাভাবিক শুল্কের চাপের ফলে ভারতের নিজস্ব শিল্প নষ্ট হয়ে গেল। শিল্প ধ্বংস করার পর ভারতীয় কৃষিক্ষেত্র থেকে কাঁচামাল সরবরাহের জন্য ১৮৩৩ সাল থেকে ইংরেজেদের ভারতে জমি কিনতে এবং খামাড় গড়ে

তোলার জন্য সুবিধা দেওয়া হতে থাকে। এই খামারগুলিতে কফি, চা, নীল, চিনি তথা আখ, রবারের চাষ শুরু হয় সরকারি উৎসাহে এই বাগিচা পণ্যটির রপ্তানির পরিমাণ আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পায়। ইংল্যান্ডে এই পানীয়টি অতিরিক্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং ১৮৪০-এর দশক থেকে ব্রিটিশ চীন সম্পর্কে নিম্নগতি দেখা দিলে ভারতে এই পণ্যটির উৎপাদনে অধিক জোর দেওয়া হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে শ্রমিকের অভাব ছিল বিশেষ সমস্যা। ১৮৬০-এর দশকে চাল, সরষে, তামাক, পাটের দাম বাড়তে থাকলে সেই ক্ষেত্রেও কৃষি-শ্রমিকের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৮৩০ সালের পর চীনে আফিমের ব্যবহার বৃদ্ধি পেলে পূর্ব ভারতের কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপকহারে আফিমের চাষ শুরু হয় এবং আফিমের উপর উচ্চ হারে শুল্ক বৃদ্ধি পায়। তবে ইঙ্গো-চীন যুদ্ধের সময় আফিম চাষের পরিমাণ ২৫.৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। যুদ্ধের শেষে ১৮৪৬-৪৭ সালে পুনরায় ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি হতে দেখা যায়। চিনি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অর্থকরী ফসলরূপে আখের চাষের উপর জোর দেওয়া হয়। এছাড়া ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে খাদ্যশস্য, তৈলবীজ, আলু প্রভৃতি উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়। ইংল্যান্ডের বস্ত্রশিল্পে আমেরিকার নীলরঞ্জক বস্তু ঔড (Woad) ব্যবহৃত হত কিন্তু স্বাধীনাতযুদ্ধের পর আমেরিকা থেকে এই বস্তুটির আমদানি কমে যায়। এছাড়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে পূর্বে এই ঔড আসত কিন্তু ১৭৮৩-৮৯ সালের সময়কালের এই জমিতে কফি, তুলোর চাষ হলে উৎপাদন কমে যায়। ফ্রান্সেরও এই রঞ্জক বস্তুটি ভূমিদাসদের দিয়ে উৎপাদন করানো হত কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের পর উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেলে ইংল্যান্ডের বস্ত্র কারখানাগুলিতে নীল রঞ্জকের অভাব সৃষ্টি হয়। তবে বাঙলার ভূমিবন্দোবস্তের জটিলতার কারণে উপযুক্ত জমির অভাব দেখা দিলে ১৮৩৩ সালের আইনে ইংরেজদের নিজস্ব জমি, খামার গড়ে তোলার অধিকার দেওয়া হয়। এরপর থেকে এইসব খামারগুলিতে সেই ধরনের পণ্য উৎপাদিত হতে থাকল যা ব্রিটেনে শিল্প ও কারখানাগুলি আরো বেশি উন্নতমানের ও ব্যাপক হাতে পণ্য উৎপাদনে সাহায্য করল। (কেমব্রিজ ইকোনমিক হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া— দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭৫৭-১৭৭০)। তাই শিল্পপুঁজির সময়কালে ১৮৪৩ সাল থেকে ১৮৫৮ সালের মধ্যে অভাবনীয়ভাবে ভারতীয় অর্থনীতির রূপান্তর ঘটে। এই রূপান্তরের প্রকৃতি ছিল ধ্বংসাত্মক। ভারতের কৃষিক্ষেত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার করে সেখানে অর্থকরী ফসলের উৎপাদন করা হল এবং এই অর্থকরী ফসল ব্রিটেনের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করল। ব্রিটেনের স্বার্থে ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে বাণিজ্য প্রবেশ করেছিল সাধারণ প্রজাদের মধ্যে খাদ্যাভাব দেখা দিল। তারা অনাহারে অর্ধাহারে থেকেও রাজস্ব প্রদানে বাধ্য থাকত। উর্বর জমিতে বাণিজ্যিক শস্যের চাষ-আবাদ করা হতে থাকল। গম প্রভৃতি খাদ্যশস্যের বাণিজ্যকরণ হলে সাধারণ মানুষ জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি শস্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। রাজস্ব প্রদানের তাগিদে গরীব কৃষক উর্বর জমিতে খাদ্যের উৎপাদনের পরিবর্তে অর্থকরী ফসল চাষ করতে থাকে। অন্যদিকে ফসলের বাণিজ্যকরণ চাষী সম্প্রদায়কে মহাজন শ্রেণীর উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য করেছিল কারণ অর্থকরী ফসল উৎপাদন ছিল যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ তাই মহাজনের উপর নির্ভরতা ছাড়া গরীব প্রজাদের অন্য উপায় ছিল না।

৩.৮ ফিনান্স পুঁজি পর্বকাল

সুমিত সরকার বলেছেন ১৮১৩ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত সময়কাল ছিল শিল্পপুঁজি শোষণের ধ্রুপদী সময়কাল। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ সময় থেকে শুরু হল ফিনান্স পুঁজির সাম্রাজ্যবাদী জয়যাত্রা। ফিনান্স পুঁজি, ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক, এজেন্সি হাউস, আমদানি-রপ্তানি ও বিনিয়োগের মাধ্যমে ভারতের অর্থনীতি, বাণিজ্য ও শিল্পের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল। (Sumit Sarkar—Modern India 1885-1947) ভারতীয় কার্পাস ও রেশমজাত পণ্যের রপ্তানি কমে যাবার পর ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায়ের অসুবিধার দিকে নজর দিয়ে প্রাথমিক ভাবে নীলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয় ও চীনে আফিম রপ্তানি করে চীন থেকে চা আমদানি করা হ'ল পরে ১৮৫০-এর পর আরো বিশদভাবে পশ্চিম ভারতীয় তুলা, বাংলার পাট, আসামের চা, দক্ষিণ ভারতের তৈলবীজ, পাঞ্জাবের গম প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করে প্রচুর অর্থ আদায়ের পথ প্রশস্ত করা হলো। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর ভারতবর্ষের কোম্পানি শাসনর অবসান হয়ে মহারাণীর তথা ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রত্যক্ষ শাসন শুরু হয়। নতুন রূপে আবির্ভূত হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শোষণ, পলাশী লুণ্ঠন, অবাধ বাণিজ্য, ব্যক্তিগত ব্যবসা, বিনিয়োগ—প্রভৃতির ফলে ব্রিটেনের জমেছিল পুঁজির পাহাড়। এই অপরিমেয় পুঁজি উপনিবেশগুলিতে বিনিয়োগ করার মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে ফিনান্স পুঁজি। একই সঙ্গে ঔপনিবেশিক শোষণ তো বর্তমান ছিলই, এই শোষণে নতুন মাত্রা যোগ করল ফিনান্স পুঁজি। ভারতের শিল্পে প্রগতি হোক এটা ফিনান্স পুঁজির যুগে গুরুত্ব পায়নি বরং ফিনান্স পুঁজি রেলপথ, খনি, বাগিচা পণ্য ও কারখানায় প্রযুক্ত হয়ে শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি করেছিল।

৩.৮.১ ফিনান্স পুঁজির প্রয়োগ ও রেলপথ স্থাপন

ফিনান্স পুঁজিকে ব্যবহার করা বা উপনিবেশগুলিতে রপ্তানি করার প্রয়োজন দেখা দিল ঔপনিবেশিক অর্থ রপ্তানি করার প্রয়োজন দেখা দিল ঔপনিবেশিক অর্থনীতির তৃতীয় পর্বে। কাজেই পুঁজি রপ্তানি ও বিনিয়োগের সূচনা হল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। ব্রিটেনের লৌহ-ইস্পাত কারখানার পুঁজিপতিরা ভারতবর্ষে রাস্তা রেলপথ নির্মাণ করতে আগ্রহী হয়। এই রেলপথ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে আধুনিক যন্ত্রশিল্পের উদ্ভব হয়। তবে রেলপথ স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল মুখ্যত রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার কারণে সৈন্যবাহিনীকে দ্রুত প্রেরণ করা ও ব্রিটেনের প্রস্তুত পণ্যকে ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে বিশাল বাজার তৈরি করা। তাই রেলপথ স্থাপনের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের উনতি বা প্রগতির কোন লক্ষ্য পরিস্ফুট হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের মতো বন্যা অনাবৃষ্টি পীড়িত রাষ্ট্রে আশু প্রয়োজন ছিল সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন। যাতায়াত ব্যবস্থার থেকে বেশি প্রয়োজনীয় ছিল উন্নতমানের সেচ ব্যবস্থা অথচ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের কাছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল উপনিবেশের অর্থনীতি দ্বারা ব্রিটেনের উন্নয়ন। রেলপথের দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ আরো সুদৃঢ় হলো। কাঁচা তুলা, নীল, খাদ্যশস্য প্রভৃতির রপ্তানির পরিমাণ প্রভূত পরিমাণ বৃদ্ধি পেল। সূতী ও পশমের প্রস্তুতপণ্যের আমদানির পরিমাণ দ্বিগুণ হল। এছাড়া যন্ত্রপাতি, সমরাস্ত্র প্রভৃতিও ব্যাপকহারে আমদানি হয় [Economic History of India, 1857-1956]।

৩.৮.২ শোষণের নতুন ক্ষেত্র ঃ রেলপথ

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে যে রেলপথ নির্মিত হল তার ঋণের বোঝা ভারতীয়দের উপর চাপানো হল। পুরো ব্যবস্থাটি ছিল "Private investment at Public risk" বাস্তবিক পক্ষে ফিনান্স পুঁজির সময় কালে ভারতবর্ষে পুঁজি রপ্তানির তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে কর বা রাজত্ব পাঠানো হয়েছিল ব্রিটেনে। ভারতীয় সম্পদকে লুণ্ঠন করেই ব্রিটিশ বণিকরা তাঁদের পুঁজি জমা করেছিল। এই পুঁজিই তারা পরবর্তীকালে নিয়োগ করল রেলপথ, সড়ক ও সেতু নির্মাণে এবং অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে ভারতীয়রা সেই রেলপথ নির্মাণের জন্য করের বোঝা বহন করতেবাধ্য হল। এই রেলপথ নির্মাণের জন্য ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের যে অর্থব্যয় হল তার উপর শতকরা ৫ টাকা সুদের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছিল সরকারি পক্ষ থেকে।

৩.৮.৩ ভারতর্ষ ঃ শোষণের মুক্ত বাজার

জাপান ও জার্মানিতে রেলপথ ব্যবস্থা যেভাবে ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন নিয়ে এসেছিল ভারতীয় রেলপত সেইভাবে ভারতবর্ষে শিল্পোন্নতি ঘটাতে পারেনি। অধ্যাপক বুকানন (Dr. D.H. Buckanan)-এর মতানুসারে বলা যেতে পারে যে যোগাযোগ ব্যবস্থার এই উন্নতিতে বিদেশ থেকে ইউরোপীয় কারিগরের নির্মিত পণ্যদ্রব্যগুলি দ্রুতগতিতে ভারতে ছড়িয়ে পড়ল এবং ভারতের তুলা, গম, তৈলবীজ প্রভৃতি ভারতের বাইরে অপসারিত হল। বাস্তবিক পক্ষে ভারতে রেলপথ স্তাপনের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য উপযোগিতার গুণগুলি ঔপনিবেশিক ভারতে অনুপস্থিত ছিল। কারণ ভারতের খনিজদ্রব্যে যেমন কয়লা, লোহা অন্যান্য ধাতু প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলেও ভারতবর্ষে শিল্পায়ন হল না। রেলব্যবস্থার উচ্চ পদগুলির মাত্র দশ শতাংশ ভারতীয়দের হাতে ছিল তাই ভারতীয় জনগণের যোগ্যতা দক্ষতা প্রদর্শনের পথ ছিল খুবই সীমিত। সুতরাং ফিনান্স পুঁজি ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে শোষণের এক নিপুণ জাল বিস্তার করেছিল রেলপথ স্থাপনের মধ্যে দিয়ে এবং এই আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতে ঔপনিবেশিক শোষণের মুক্ত বাজারে পরিণত হয়েছিল। (সরল চট্টোপাধ্যায় : ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ)

৩.৮.৪ রেলপথ স্থাপনের ফলাফল

ভারতে রেলপথ স্থাপনের অবধারিত ফলাফল রূপে শিল্পায়নের আশা কিন্তু সফল হয়নি। কার্ল মার্কস আশা করেছিলেন রেলপথ স্থাপিত হলে ভারতে শিল্পায়ন সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু রেলপথ স্থাপিত হলেও ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ রূপেই পরিচিত হয়ে রইল। এসত্ত্বেও বলা যায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ভারতীয়দের মধ্যে মতামতের বিস্ময় সহজ হয়ে ওঠে, জাগরিত হয় জাতীয়তাবোধ। যদিও ভারতে রেলপথ স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্যিক। কারণ ভারতবর্ষের উন্নতি, প্রগতির দিকে লক্ষ্য রেখে রেলপথ স্থাপিত হয়নি। তবুও রেলপথের স্থাপনা এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতে যখন শিল্পায়ন হল তখন রেলপথ স্থাপনের পরোক্ষ ফলগুলি সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষকে প্রগতির পথে নিয়ে গিয়েছিল। রেলপথ স্থাপনের পরোক্ষ ফলগুলির মধ্যে খনিশিল্পের বিকাশ, আধুনিক শিল্পের বিকাশ, কৃষি উন্নতি উল্লেখযোগ্য।

৩.৮.৫ ভারতে শিল্পোদ্যোগের অভাব

ভারতবর্ষে কুটির শিল্প, হস্তশিল্প বিনষ্ট হয়ে যাবার পর আধুনিক শিল্প বিকশিতহবার মধ্যে অনেকটা সময়ের ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। এর মূলে যে কারণগুলি বর্তমান ছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভারতে কোন রূপ মূলধন ও মূলধনী শ্রেমীর বিকাশ হয়নি, ভারতীয় শিল্পোদ্যোগী সম্প্রদায় ছিলেন না, ভারতীয়দের মধ্যে কারিগরী শিল্পজ্ঞানের অপ্রতুলতা ছিল সরকারি উৎসাহের অভাব, কৃষিব্যবস্থার পশ্চাৎগামিতা সর্বোপরি ছিল পরাধীন ভারতবর্ষের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণ।

৩.৮.৬ শিল্পায়নের সূচনা

এইসব প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও ভারতে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শিল্পায়নের সুচনা হয়। বস্ত্র, পাট, চা, লৌহ-ইস্পাত, চিনি, কয়লা, কাগজ প্রভৃতি শিল্প ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে। বিশ্বে পাটের তথা পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে পূর্বভারতে পাটকল স্থাপিত হয়। পূর্বভারতের প্রধান শিল্পগুলির মধ্যে পাট, চা, কয়লা, তৈলবীজ প্রভৃতি দ্রব্য এবং এই শিল্পজাত দ্রব্যগুলি ছিল রপ্তানি নির্ভর। পশ্চিমভারতে ছিল তুলা, তুলাজাত পণ্যদ্রব্য, কফি ইত্যাদি। বোম্বাইতে ভারতীয় মালিকানায় জনৈক কাওয়াসজী নানাভাই ১৮৫৩ সালে সর্বপ্রথম কাপড়ের কল স্থাপন করেন।

৩.৮.৭ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে ভারত-ব্রিটেনে বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছিল। ভারত থেকে কৃষিজ পণ্য রপ্তানি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে আর বিলাতী আমদানিও সহজসাধ্য ছিল না। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ভারতে শিল্পগঠনের এক আকস্মিক সুযোগ এসে পড়ে। যে সব শিল্পগুলি, এখানে বর্তমান ছিল সেই শিল্পজাত পণ্যগুলি সরবরাহ করে যুদ্ধের বাজারে পাট, বস্ত্র প্রভৃতি শিল্পের মালিকরা প্রচুর মুনাফা অর্জন করেন। এছাড়া এশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে সমরাস্ত্রের প্রয়োজনে ব্রিটেন তার নিজ স্বার্থে পূর্ববর্তী নিয়মের পরিবর্তন করে ও ভারতীয় শিল্পোদ্যোগীদের জন্য শিল্পকাঠামো গড়ে তোলে। আবার ১৯০৫ সালের যে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল তাও দেশী পণ্যবস্তু উৎপাদন (Production)-এ ও দেশীয় বাজারে তার আবর্তনে (Circulation) অনেক বেশি সহায়তা করেছিল। পূর্বভারতে পাটজাত দ্রব্যের ও পশ্চিমভারতে তুলাজাত দ্রব্যের রপ্তানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মুনাফা অর্জন করে। এই অর্থ যুদ্ধ-পরবর্তী কালে নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য বিনিয়োগ করা হয়। ডঃ অমিয় বাগচী তাঁর Private Investment in India গ্রন্থে বলেছেন, The First World War marked a major structural break as fast teh composition of private investment in modern manufacturing industry was concerned." তাই দেখা গেল ভারতে বেসরকারী বা ব্যক্তিগত পুঁজির উৎপত্তি হল যা নিযুক্ত হল নতুন শিল্প গঠনে। এইসব সুযোগ নিয়ে এল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। বস্ত্রশিল্প, পাটশিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় এই সময়ে।

৩.৮.৮ বিশ্বব্যাপী মন্দা ও ভারতীয় শিল্প

অমিয় বাগচীর মতে ১৯৩০-৩১ সালে পাটশিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ অনেক হ্রাস পায়। অন্যদিকে বস্ত্রশিল্পে এই বিনিয়োগ যথেষ্ট ছিল। এর কারণ হিসাবে বলা যায় পাট, চা, কয়লা ছিল রপ্তানির উপর নির্ভরশীল শিল্প। তাই যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক মন্দার সময়ে এইসব শিল্পে মন্দা দেখা দিয়েছিল। অথচ বস্ত্রশিল্পের উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা ভারতের অভ্যন্তরে বৃদ্ধি পেলে পশ্চিম ভারতের বস্ত্রশিল্প মন্দার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যায়। তাই বিশ্বব্যাপী মন্দা পাটশিল্পে সঙ্কট ডেকে আনে। পাট শিল্পে লগ্নী হত ইউরোপীয় মূলধন। এছাড়া ভারতের শিল্পে বেশিরভাগ ইউরোপীয় পুঁজিপতিদের আধিপত্য ছিল। পশ্চিমভারত এক্ষেত্রে ছিল ব্যতিক্রম। তাই স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশরা চলে যাবার সঙ্গে বিদেশী পুঁজিও অপসারিত হয়। পূর্বভারতের শিল্পগুলি হতশ্রী হয়ে পড়ে। এখানে কোন বিকল্প শিল্প গড়ে ওঠেনি। যদিও বাঙলায় বস্ত্রশিল্প স্থাপনের প্রচেষ্টা হয়েছিল কিন্তু তা সাফল্য লাভ করেনি। এখানে পাটশিল্পের পরিপূরক কোন শিল্প গড়ে উঠতে পারেনি। অথচ পশ্চিমভারতে দেশীয় পুঁজিপতিদের নেতৃত্বে শিল্পগুলি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কারণ পশ্চিমভারতের শিল্প-বাণিজ্য ছিল ভারতীয়দের হাতে।

৩.৯ স্বাধীন ভারতের শিল্পোদ্যোগ

পাশী, গুজরাটী সম্প্রদায়ের যে মূলধন সঞ্চয় ও লগ্নী করার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল তা বাঙ্গালী, বিহারী, দক্ষিণ ভারতীয়দের মধ্যে এই লক্ষণ দেখা যায়নি। পূর্বভারতে বিদেশী পুঁজি বেশি পরিমাণে বিনিয়োগ করে ব্রিটিশরা একচেটিয়া মুনাফা অর্জন করেছিল বাঙ্গালী, বিহারীরা এখানে প্রবেশাধিকার পায়নি। অন্য দিকে বোম্বাই, আমেদাবাদ একটি কিংবা দুটি ব্রিটিশ কোম্পানি ছাড়া তুলাজাত পণ্য উৎপাদনে অন্য কোন কোম্পানি উৎসাহ দেখায়নি। এই শূন্যস্থান পূরণ করতে গুজরাটী, পার্শীরা অগ্রসর হন এবং পশ্চিমভারত এইসব শিল্পোদ্যোগের নেতৃত্বে স্বাধীনতার পর শিল্প নতুন প্রযুক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিল। তবে পূর্ব-ভারতেও বেঙ্গল কেমিক্যালস্, ন্যাশানাল ট্যানারী প্রভৃতি শিল্পের নাম উল্লেখযোগ্য।

৩.১০ সারাংশ

ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়ায় বিপর্যস্ত হয়েছিল অর্থনৈতিক কাঠামো। কৃষির বিনাশ, শিল্পে অবক্ষয়, বাণিজ্যের সঙ্কট—সবকিছুর মিলিত আঘাত এসে পড়েছিল অর্থব্যবস্থার উপর। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ভারতের স্বনির্ভর অর্থনীতিকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। আর্থিক স্বচ্ছল ভারতবাসীর উপর নেমে এসেছিল অপরিসীম দারিদ্র্য। শিল্পের ধ্বংস সাধন, বহির্বাণিজ্যের বিলুপ্তির ফলে বহু মানুষ জীবিকা হারায় এবং কৃষিক্ষেত্রের উপর চাপ সৃষ্টি করে। বলপূর্বক ভারতের শিল্পবাণিজ্যের বিনাশ করে ভারতবর্ষকে

কৃষিনির্ভর রাষ্ট্রে পরিণত করা হয় এবং ব্রিটেনের স্বার্থে ভারতের কৃষিব্যবস্থা পরিচালিত হতে থাকে। ভারত পরিচিত হল ব্রিটেনের উপনিবেশ হিসাবে এবং ভারতের অর্থনীতি রূপান্তরিত হল ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে।

৩.১১ অনুশীলনী

ক। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। ভারতের সর্বাপেক্ষা উন্নত শিল্পটির নাম লিখুন

২। বাঙ্গালী জাহাজ মালিকের নাম কি?

৩। ভারতের কোন অঞ্চল কাগজ শিল্পের জন্য বিখ্যাত?

৪। কাঁচশিল্প কোথায় ছিল?

৫। ভারতের রপ্তানিজাত পণ্যগুলির নাম কি?

৬। ভারতীয় বস্ত্রের উপর ব্রিটিশ আইন কবে পাশ হয়?

৭। কয়েকটি অর্থকরী ফসলের নাম লিখুন।

৮। ১৮১৩ সালের সনদ আইন গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৯। ইংল্যান্ডের বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত রঞ্জক বস্তুটির নাম কি?

১০। কত সালে এবং কোথায় প্রথম কাপড়ের কল কে স্থাপন করেন?

খ। সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১। পলাশী লুণ্ঠন কি? অপহার কাকে বলে?

২। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

৩। ভারতীয় পণ্য রপ্তানির উপর ব্রিটিশ আইন কী প্রভাব ফেলেছিল?

৪। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ভূমিহীন কৃষকের উত্থান কীভাবে হল?

৫। বাণিজ্য পুঁজি ও শিল্প পুঁজির উদ্দেশ্য সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৬। স্বাধীন ভারতের শিল্পোদ্যোগ সম্পর্কে কী জানেন ?

গ। দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১। ভারতের কৃষি ব্যবস্থার উপর শিল্পের বিনাশকারী প্রভাব আলোচনা করুন।

২। ভারতীয় শিল্প ধ্বংস হল কীভাবে?

৩। রেলপথ স্থাপনের মধ্যে দিয়ে ভারত কীভাবে নতুন শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত হয়?

৪। ভারতীয় কৃষিপণ্যের বাণিজ্যকরণ ও তার প্রভাব আলোচনা করুন।

৩.১২ গ্রন্থপঞ্জি

1. Sumit Sarkar—Modern India, 1885-1947.
2. Amiya Bagchi—Private Investment in India.
3. The Cambridge Economic History of India, Vol. (II) 1751-1970.
4. Bipan Chandra—ise and Growth of Economic Nationalism in India.
5. V.B. Sing (ed)—Economic history of India, 1857-1956.
6. P.N. Chopra, B.N. Puri, M.N. Das—A social cultural and economic history of India, Vol. II.
7. নরহরি কবিরাজ (সম্পাদিত)— অসমাপ্ত বিপ্লব, অপূর্ণ আকাঙ্খা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, কে. পি. বাগচী।
8. Irfan Habib—Essays in Indian History towards a Markist perception.
9. Hermann Kulke, Dietmar Rothermund 3rd edition—A history of India, Dietmar Rothermucd, 3rd edition.
10. R.K. Ray : Industrialisation of India.
11. S.K. Sen : Economic History of India. Vol.II.